

# সম্পদের উৎপাদন ও সমতার নীতি

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য কয়েকটি পণ্যের তালিকা তৈরি করব। এরপর এই সব পণ্য থেকে যেগুলো প্রয়োজনীয়, অতীব প্রয়োজনীয় ও কম প্রয়োজনীয় তা নির্ণয় করব। প্রয়োজনীয় ও অতীব প্রয়োজনীয় পণ্য বা দ্রব্যগুলোর বর্তমান ও একবছর আগের বাজার মূল্য নিকটস্থ কোনো বাজার পরিদর্শন করে জেনে নিব। এই পণ্য বা দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে সমাধান করব।



## দলগত কাজ ১:

এখন চলো আমরা ৫-৬ জন নিয়ে একটি দল গঠন করে ফেলি। দলে আলোচনা করে আমরা প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য কয়েকটি পণ্যের তালিকা তৈরি করি। এগুলোর মধ্যে কোনগুলো অতীব প্রয়োজনীয়, প্রয়োজনীয় ও কম প্রয়োজনীয় তা নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

## পণ্য বা দ্রব্য নির্বাচন ছক

অতীব প্রয়োজনীয় দ্রব্য	প্রয়োজনীয় দ্রব্য	অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয়

আমরা উপরোক্ত ছকগুলোর মধ্যে অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর মূল্য বা দাম সম্পর্কিত একটি জরিপ পরিচালনা করব। নিকটস্থ কোনো বাজার পরিদর্শন করে পণ্য বা দ্রব্যের মূল্য বা দাম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করব। আমরা দলে আলোচনা করে একটি জরিপ ফর্ম তৈরি করব। নিচে একটি নমুনা জরিপ ফর্ম দেওয়া হলো।

জরিপ ফর্ম		
স্থান:	বাজার/দোকানের নাম:	
পণ্যের নাম	পণ্যের মূল্য	
	বর্তমান মূল্য	এক বছর আগের মূল্য
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

এরপর আমরা জরিপ ফর্মের তথ্য থেকে যেগুলোর মূল্য বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলো নির্ধারণ করি। দলের কাজ শেষ হলে প্রতি দল থেকে ১-২ আমাদের দলের কাজ উপস্থাপন করি।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সমস্যাটি কীভাবে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে সমাধান করা যায় সেটি নিয়ে আমরা কাজ করব। কিন্তু তার আগে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। এই জন্য আমরা নিচের অংশটুকু পড়ে নিই।

## অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা

আমরা আমাদের জীবনে অনেক বস্তু বা দ্রব্য পেতে চাই। ইচ্ছা থাকলেও আমরা অনেক সময় সেই বস্তু বা দ্রব্য পাই না বা ক্রয় করি না। চলো আমরা খুঁজে বের করি আমাদের জীবনে এমন কী কী আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আমাদের কোন কোন দ্রব্যের অভাব রয়েছে। সবগুলো দ্রব্য কী আমরা একসঙ্গে পেতে পারি? কোন দ্রব্য পাওয়ার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশি? কোন দ্রব্যগুলো দুস্প্রাপ্য অর্থাৎ সহজে পাওয়া যায় না?



### অনুশীলনী ১:

ক্রম	আকাঙ্ক্ষা বা অভাববোধ রয়েছে- দ্রব্যের নাম	এটি কী খুব প্রয়োজনীয়? (হ্যাঁ/না)	এটি কী দুস্প্রাপ্য দ্রব্য? (হ্যাঁ/না)
১.			
২.			
৩.			
৪.			

মানুষ বা ভোক্তা সব অভাব বা আকাঙ্ক্ষা একত্রে পূরণ করতে পারে না তাই অসীম অভাবের মধ্যে থেকে তাকে বাছাই করতে হয় কোন অভাবটি আগে পূরণ করবে। এই বাছাই প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিতে নির্বাচন (Choice) হিসাবে গণ্য করা হয়। ভোক্তা তাঁর অভাবগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করে থাকে কোন অভাবগুলো আগে পূরণ করবে। যে অভাবটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভোক্তা তা আগেই পূরণ করার চেষ্টা করে। ভোক্তা যেমন তার সব অভাব একসঙ্গে পূরণ করতে পারে না ঠিক তেমনি উদ্যোক্তাও সব পণ্য বা সেবা একসঙ্গে উৎপাদন করতে পারে না। কারণ সম্পদ সীমিত ও ভোক্তার অসীম চাহিদা। সম্পদ হচ্ছে যে সব দ্রব্য বা পণ্য মানুষের অভাব পূরণ করে। কিন্তু এর যোগান অপ্রতুল। চলো সীমিত সম্পদ ও ভোক্তার অসীম চাহিদার সমস্যাটি আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি। যেহেতু উদ্যোক্তার সম্পদ সীমিত এবং ভোক্তার আকাঙ্ক্ষা অসীম তাই উদ্যোক্তা কীভাবে সীমিত সম্পদে অধিক পরিমাণে ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন তা নিয়ে ভেবে নিচের ছকটি পূরণ করি।



## অনুশীলনী ২

ক্রম	কেন্দ্রীয় সমস্যা সমাধানে উদ্যোক্তার করণীয়

আমরা সবাই মিলে বেশ কিছু বিষয় লিখেছি। এই বিষয়গুলোর সঙ্গে আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলোর হয়তো মিল খুঁজে পাব। তার আগে আমরা রূপকের গল্পটি পড়ে নিই এবং কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।

রূপক খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। তার আঁকা ছবি বন্ধু ও এলাকার মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয়। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অনেকেই তাকে কার্ড, টি-শার্ট বা মগের ওপর ছবি এঁকে দিতে বলে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে পারিশ্রমিকও দিয়ে থাকে।

পরিচিত অনেকেই রূপককে এই বছরের পহেলা বৈশাখে কার্ড তৈরি করে বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছে। পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করে রূপক সিদ্ধান্ত নিল পহেলা বৈশাখে কার্ড বানিয়ে বিক্রি করবে। তাই কার্ড তৈরি করার আগে কারা কারা কার্ড কীভাবে তৈরি করে এমন একটি লিস্ট করল। তার এই পরিকল্পনার কথা শুনে বন্ধু, পরিচিত ও এলাকাবাসী মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন তার কাছ থেকে কার্ড কেনার আগ্রহ দেখাল।

রূপকের কার্ড বানানোর জন্য যে কাগজ ও রঙ পেন্সিল দরকার সেগুলো ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তাই সে বাজারে গিয়ে কাগজ ও রঙ পেন্সিল কেনার সিদ্ধান্ত নিল।

রূপকের কাছে ১০০০ টাকা আছে। সেই টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে দেখলো কার্ড বানানোর জন্য ২ ধরনের কাগজ আছে। এক ধরনের প্রতিটি কাগজের মূল্য ১০ টাকা। আরেক ধরনের প্রতিটি কাগজের মূল্য ১২ টাকা। অন্যদিকে একটা বক্সে ১০টি রঙ পেন্সিল আছে তার দাম ১৫০ টাকা এবং আরেকটাতে ১৫টি রঙ পেন্সিল আছে যার দাম ২০০ টাকা। রূপক দেখল ১,০০০ টাকা দিয়ে ১০০ জনের জন্য কার্ড বানানো সম্ভব নয়। তাই তাকে কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল।

আমরাও রূপকের সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করি।



### অনুশীলনী ৩:

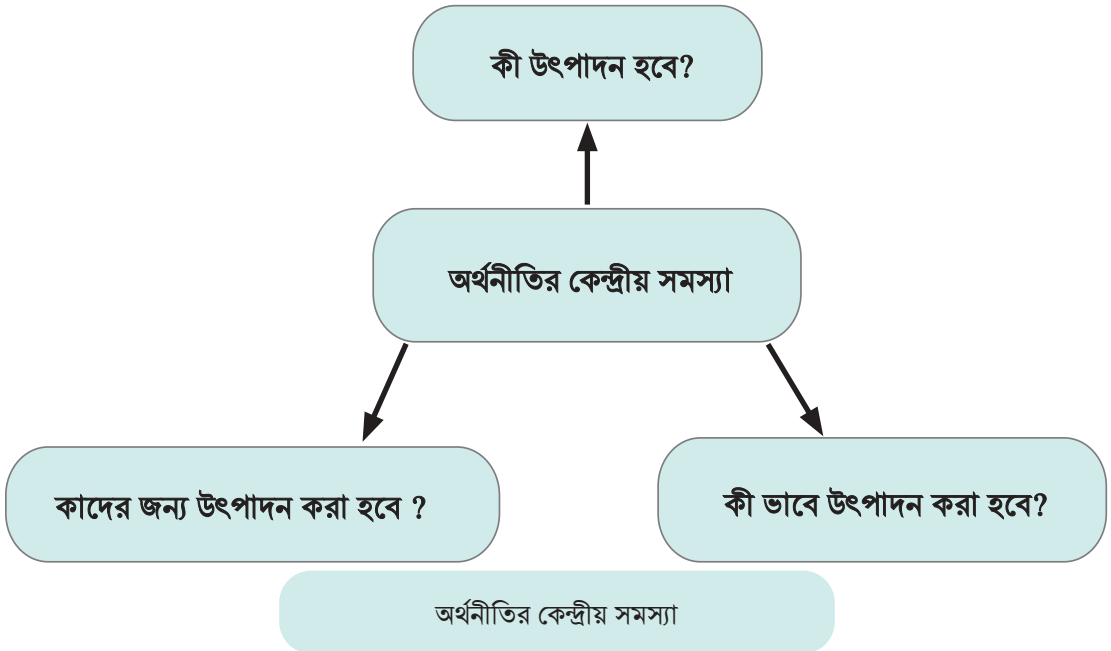
রূপক কী তৈরি করবে? কত পরিমাণে তৈরি করতে পারবে? (What to produce & how much?)	
রূপক কীভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় কার্ডগুলো তৈরি করবে? (How to produce?)	
রূপক তার পণ্য (কার্ড) কাদের জন্য তৈরি করবে? (For whom to produce?)	

চলো আমরা এখন অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাব।

## অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা (Central Problem of an Economy)

একজন উৎপাদক (বা ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা বা দেশ বা অর্থনীতি) সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা একসঙ্গে উৎপাদন করতে পারেন না। একজন ভোক্তা যেমন তঁর সকল অভাব একত্রে পূরণ করতে পারেন না তেমনি একজন উদ্যোক্তাও সকল পণ্য ও সেবা একসঙ্গে উৎপাদন করতে পারেন না। যেহেতু একটি দেশের বা অর্থনীতির সম্পদ সীমিত বা অপরিমিত তাই ইচ্ছা করলেই আমরা সব জিনিস/দ্রব্য-সেবা সামগ্রী উৎপাদন করতে পারি না। তখন আমাদের চিন্তা করতে হয়:

- ✓ কী দ্রব্য উৎপাদন করা হবে এবং কী পরিমাণে উৎপাদন করা হবে? (What to produce & how much?)
- ✓ কীভাবে উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)
- ✓ কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?)



সম্পদের স্বল্পতা বা অপরিপূর্ণতাই হলো কেন্দ্রীয় সমস্যার মূল কারণ। আমরা কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

### ১। কী দ্রব্য উৎপাদন করা হবে? (What to produce?)

প্রতিটিটি অর্থনীতি বা সমাজকে অনেক গুলো সম্ভাব্য বিকল্প দ্রব্য ও সেবা থেকে কোন কোন দ্রব্য ও সেবা কতটুকু উৎপাদন করবে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একটা দেশের অর্থনীতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় কোন কোন দ্রব্যগুলো আগে উৎপাদন করবে এবং কী পরিমাণে উৎপাদন করবে।

ধরো আমাদের মৌলিক চাহিদা অন্ন / খাদ্য , বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা-চিকিৎসার অভাব আগে পূরণ করব না বিলাস দ্রব্য/ যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করব । আমাদের সম্পদ যেহেতু সীমিত, তাই সব মৌলিক চাহিদাও একত্রে পূরণ করতে পারব না । তখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন দ্রব্য কী পরিমাণ উৎপাদন করব । যেমনঃ আমাদের সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন কোন খাতে বাজেটের/ সম্পদের বেশি ব্যবহার করতে হয়। সরকারের যেহেতু সীমিত বাজেট বা সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে তাই সরকার ইচ্ছে করলেও সব খাতে একত্রে বেশি বরাদ্দ বা ব্যয় করতে পারে না । তাই বিভিন্ন ধরনের বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

### ২। কীভাবে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)

একজন উৎপাদককে বা সংগঠককে বা রাষ্ট্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কী উৎপাদন করা হবে ? এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাকে আবার ভাবতে হয় এই দ্রব্যগুলো কীভাবে বা কী প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হবে? এক্ষেত্রে উৎপাদককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সে কী বেশি পরিমাণ শ্রম এবং কম পরিমাণ মূলধন বা কম পরিমাণ শ্রম লাগিয়ে বেশি পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করে উৎপাদন করবে। আমরা যখন একটি কৃষি খামার পরিদর্শন করেছি তখন দেখেছি যে, শ্রমিকের ব্যবহার বেশি হচ্ছে যন্ত্রপাতির অর্থাৎ মূলধনের তুলনায়।

আবার যখন তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় পরিদর্শন করেছি তখন দেখেছি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে কীভাবে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমের পরিবর্তে মূলধনের ব্যবহার বেশি হচ্ছে। এক্ষেত্রে একজন মালিককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি কোন ধরনের উপকরণ কী পরিমাণে ব্যবহার করবেন ।

তবে সাধারণত যে দেশে প্রচুর সংখ্যাশ্রমিক পাওয়া যায় অর্থাৎ শ্রমঘন অর্থনীতির দেশ সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে যে সব দেশে মূলধনের প্রাচুর্য রয়েছে তারা উৎপাদনে কম পরিমাণ শ্রম এবং বেশি পরিমাণ মূলধন বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।

### ৩। কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?)

কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? এটিকে আমরা সহজে বলতে পারি যে, উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা কারা ভোগ করবে অথবা কাদের মাঝে বণ্টিত হবে? উৎপাদনের উপকরণের মালিকরা কে কী পরিমাণ ভোগ করবে? কে বেশি পাবে অথবা কে কম পাবে? অর্থনীতিতে সবার মৌলিক চাহিদা পূরণ করা উচিত নাকী উচিত নয়?

উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন কীভাবে হবে এবং কাদের মাঝে কতটুকু বণ্টন হবে, এই প্রশ্নের সমস্যার সম্মুখীন হয়। যে-কোনো দেশের/ অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা হল, অপরিাপ্ত সম্পদের বণ্টন এবং চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার সৃষ্টি বিতরণ ব্যবস্থাপনা। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সব অভাব/ আকাঙ্ক্ষা একসঙ্গে পূরণ করতে পারি না তেমনি একটি দেশের অর্থনীতিতেও সম্পদের স্বল্পতা থাকার কারণে সব দ্রব্য ও সেবা একত্রে উৎপাদন করতে পারে না। যার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয় যাকে আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছি।



## দলগত কাজ ২:

এখন আমরা পূর্বের মতো দলে বসি। এর আগে আমরা কিছু পণ্যের বাজার মূল্য বেশি তা নির্ধারণ করেছিলাম। মনে আছে? চলো, এখন এলাকার মানুষের জন্য সেই পণ্য বা দ্রব্যগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে বিবেচনা করি। তার আগে আমরা সপ্তম শ্রেণির ‘সম্পদের কথা’ শিখন অভিজ্ঞতা থেকে উৎপাদনের উপাদান/উপকরণ সম্পর্কে জানব। আমরা দলে আলোচনা করে আমাদের নির্ধারিত বেশি মূল্যের দ্রব্য বা পণ্য কী পরিমাণে উৎপাদন করা প্রয়োজন, কীভাবে উৎপাদন (উৎপাদনের উপাদান/উপকরণ) করা প্রয়োজন এবং কার জন্য (ভোক্তা কারা) উৎপাদন করা প্রয়োজন তার সম্ভাব্য পরিমাণ, উপায় ও ভোক্তা নির্ণয় করব। মনে রাখব, সম্ভাব্য ভোক্তা নির্বাচন করার সময় ভোক্তার আয় এবং উৎপাদকের উৎপাদনের উপকরণ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। একটি নমুনা উত্তর দেওয়া হল।



## অনুশীলনী ৩:

পণ্য (যে সব পণ্যের মূল্য বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে) (What to Produce)	কী পরিমাণে উৎপাদন (How much/many)	কীভাবে উৎপাদন (How to produce)	কার জন্য উৎপাদন (Whom to produce)
চাল	এলাকার পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫ থেকে ৬ জন। প্রতি পরিবারে প্রতিদিন আনুমানিক ৩ কেজি চাল লাগে। এলাকায় প্রায় ১০০ টি পরিবারের জন্য দৈনিক আনুমানিক ৩০০ কেজি চাল লাগবে।	কৃষক ভূমি ও অর্থের মাধ্যমে বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয় করবেন। তিনি শ্রমিক নিয়োগ দিবেন। তিনি স্থানীয় বাজারে তা বিক্রি করবেন। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষককে আর্থিক সহায়তা দিলে তিনি উৎপাদনের উপকরণের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারবেন। ফলে উৎপাদন বাড়বে।	এলাকার মানুষ





## দলগত কাজ ৩:

আমরা আমাদের নির্ধারিত পণ্যগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ভোক্তা নির্ধারণ করেছি। এখন আমরা এগুলোর বণ্টন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি। আমাদের সুবিধার জন্য একটি নমুনা উত্তর দেখানো হল।

পণ্য	বণ্টন প্রক্রিয়া	সংরক্ষণ
চাল	এলাকার সব পরিবারের কাছে চাল বণ্টন করার জন্য পরিবারগুলোর ক্রয় ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে। এই ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে চালের দাম নির্ধারিত হবে। এরপর স্থানীয় বাজারের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।	চাল সারা বছর সংরক্ষণ করার জন্য গুদাম ঘরের ব্যবস্থা ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এখন আমরা দলে আলোচনা করে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে সমাজে কী কী বৈষম্য দেখা দিতে পারে তা শনাক্ত করে লিখি।

দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে সমাজে সৃষ্ট বৈষম্য

এখন আমরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নিই।

### ১. পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর মাধ্যমে সৃষ্ট বাজার ব্যবস্থা অনুযায়ী হয়। এখানে সরকার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে না। কী উৎপাদন করবে এবং কী পরিমাণ উৎপাদন করবে তা নির্ভর করে বাজারে কোন দ্রব্যের/পণ্যের চাহিদা রয়েছে তার ওপর। বাজারে যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা ব্যাপক থাকে এবং তার বিনিময়ে বিক্রেতা ভালো দাম পায় তাহলে বাজার অর্থব্যবস্থায় ঐ পণ্যের উৎপাদন বেশি হয়। এ কারণে এ ব্যবস্থাকে অনেক সময় বাজার অর্থনীতিও বলা হয়।

কীভাবে দ্রব্যটি উৎপাদিত হবে? বাজার অর্থব্যবস্থায় নিম্নরূপে এর সমাধান হয়:

উৎপাদনকারী/উদ্যোক্তা হিসাব করে দেখে, কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করলে তার উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হয়। সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে তারা উৎপাদন করে থাকে। যেমন: যে দেশ দরিদ্র ও জনসংখ্যা বেশি সেখানে কম মূল্যে শ্রম পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কম পরিমাণে মূলধন বা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কারণ সেখানে শ্রমিককে অল্প পরিমাণে মজুরি দিয়ে কম খরচে অধিক উৎপাদন করিয়ে নেওয়া যায়।

আবার যে দেশে/স্থানে শ্রমের মূল্য অধিক বা শ্রমিককে বেশি মজুরি দিতে হয় সে দেশে/স্থানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বেশি পরিমাণে মূলধন বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি হয় এবং কম পরিমাণ শ্রমিক ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বাজার অর্থব্যবস্থায় উৎপাদক কী উৎপাদন করবেন এবং কীভাবে উৎপাদন করবেন এ দুই ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ভোগ করেন।

বর্তমানে খাঁটি/বিশুদ্ধ বাজার অর্থব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলতে তেমন কোনো দেশ নেই। কারণ ভোক্তার সুবিধার্থে প্রতিটি দেশকেই বাজারের ওপর কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ করতে হয় বা সরকারের হাতে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রাখতে হয় জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে। তাই বাস্তবে বিশুদ্ধ বাজার অর্থব্যবস্থা পাওয়া সত্যিই কঠিন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশে বাজার অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে। যাকে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ বলা হয়।

বাজার অর্থব্যবস্থায় একজন উৎপাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে নূন্যতম খরচে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। এইজন্য উৎপাদন খরচ যতই কম পরিমাণে হবে ততই তার মুনাফা বাড়বে। উৎপাদন খরচ কমাতে হলে, উৎপাদক/উপকরণের মালিককে যথাসম্ভব কম মূল্য পরিশোধ করতে দেখা যায়। যেমন: একজন শ্রমিক দিনে উৎপাদনে যে পরিমাণে অবদান রাখেন বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে মূল্য সৃষ্টি করেন তাকে কিন্তু মজুরি হিসাবে খুবই কম পরিমাণ পরিশোধ করা হয়।

বাজার অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করেন। অর্থাৎ একজন ভোক্তা তার পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী বাজার থেকে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে পারেন। বাজার অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনে দক্ষতা অর্জিত হয়। অনেক ধরনের উদ্যোক্তা থাকার কারণে বাজারে এক ধরনের প্রতিযোগিতাও কাজ করে। এর ফলে উৎপাদকদের মাঝে মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদনে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ফলে বাজার অর্থব্যবস্থায় কিছু সুফলও পাওয়া যায়। যার ফলে ভোক্তারা অনেক সময় উপকৃত।

## ২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করবে এবং কাদের মাঝে উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টিত হবে সবকিছুই কেন্দ্রের/রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে। একে পরিকল্পিত বা নির্দেশনামূলক অর্থব্যবস্থাও বলা হয়।

সমাজে যাতে বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ না করে এজন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভূমি, শ্রম, মূলধন, কলকারখানা, গণপরিবহণ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বিমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি সব কিছুরই মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে। রাষ্ট্র পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ এবং সমাজের জন্য কী দ্রব্য প্রয়োজন সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার বা ভোক্তার কোনো ধরনের মতামত বা স্বাধীনতা থাকে না। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবাই যৌক্তিক বা নিয়ন্ত্রিত আচরণ করে। এই অর্থব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এখানে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রায় শূন্য বা অনুপস্থিত। মূল্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোনো ভোক্তা বা ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তার দাম নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ নেই।

ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত আয়ের মাধ্যমে কোনো ভোক্তা কী পরিমাণ ভোগ করবে তা নির্ভর করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যেহেতু উপকরণের বা সম্পদের মালিকানা থেকে কোনো ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি হয় না তাই ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ এবং কোন দ্রব্য ও সেবা ভোগ করবে তা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর। বর্তমানে উত্তর কোরিয়া একটি সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। চীন ও কীউবায় আংশিক সমাজতন্ত্র চালু আছে।

তান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বণ্টননীতি হলো ‘প্রতিটি অবদান রাখবে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী এবং পাবে

তার প্রয়োজন অনুযায়ী। তবে বাস্তবে দেখা যায়, এ অর্থনীতিতে প্রতিটি তার প্রাপ্য পায় উৎপাদন কাজে তার অবদান অনুযায়ী। এ অর্থনীতিতে সমাজের কেউই যাতে সম্পদের বন্টন থেকে বিচ্যুত না হয়, তার জন্য রেশন কার্ডের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বন্টন করা হয়।



সমাজের এক একজন ব্যক্তি তার নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং সে কাজের ধরন অনুযায়ী বা অবদান অনুযায়ী প্রকৃত পারিশ্রমিক পাবে।

### ৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা

বিশ্বে বর্তমানে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দু'টি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মিশ্রণ দেখা যায়। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি যেমন প্রচলিত রয়েছে পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও সরকারের নজরদারিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় মালিকানাই বিদ্যমান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাজারপ্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে মিশ্র অর্থনীতি বলে।



## ৪. কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা

কল্যাণমূলক অর্থনীতির মাধ্যমেও কিছু কিছু দেশ অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো সমাধান করে থাকে। কল্যাণমূলক অর্থনীতির মূল/প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানবকল্যাণ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক উন্নতমানের মৌলিক চাহিদা সরবরাহ করা যাতে নাগরিকরা বৈধ আয়ের মাধ্যমে বাজার থেকে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা নাগরিকের কর্মসংস্থানের অব্যাহতি সুযোগ করে দেয়। এই অর্থব্যবস্থার মূল আকর্ষণ হচ্ছে সম্পদ ও আয়ের বণ্টন অত্যন্ত ন্যায্যভিত্তিক, সম্পদের বণ্টন এমনভাবে করা হয় যাতে কেউ তার মানবিক জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সবার উন্নতমানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং গৃহ নিশ্চিত করা হয়। এখানে আয়ের বৈষম্য তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ধনীদের প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা আরওপ করে তা রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে বণ্টন করে থাকে।



কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে সরকার তার নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এই অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সহাবস্থান বিরাজ করে। এই অর্থব্যবস্থার মূলনীতি হলো সকলের জন্য সমান সুযোগ, সম্পদের সুষম বণ্টন। সমাজে যাঁরা একটি সুন্দর জীবনের নূন্যতম প্রয়োজনগুলো মিটাতে পারেনা তাঁদের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সব জনগণের। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টিত, বেকারত্ব ভাতা, এবং সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য ভাতা বা কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি হলো একটি কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের উদাহরণ।

কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থায় পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন উৎপাদনব্যবস্থা তারা সাধারণত পরিহার করে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান (সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ইত্যাদি) দেশগুলো তাঁদের পরিবেশের জন্য উপযোগী জ্বালানী ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। পরিবেশদূষণ হয় এমন কোনো জ্বালানী ব্যবস্থা তারা ব্যবহার করে না। নাগরিকের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করে। এ অর্থব্যবস্থায় আইনের শাসনের প্রতি মানুষের আস্থা থাকে। কারণ এখানে নাগরিকের বাকস্বাধীনতা থাকে এবং সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

### বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা

আমাদের দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিশ্র অর্থব্যবস্থা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাজার অর্থনীতি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সমন্বয় রয়েছে। বাংলাদেশে কল্যাণ অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। এখানে সম্পদের মালিকানা ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র যৌথভাবে উপভোগ করে। এখন বেসরকারি বিনিয়োগ মোট দেশজ পণ্য বা দ্রব্য (Gross Domestic Product, GDP) -এর প্রায় ৩৫%। আমাদের অর্থনীতির বিশাল অংশ বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীল। সরকারি বিনিয়োগ সাধারণত বিদ্যুৎ খাতে, অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। এক কথায় ব্যক্তি উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় বাংলাদেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে

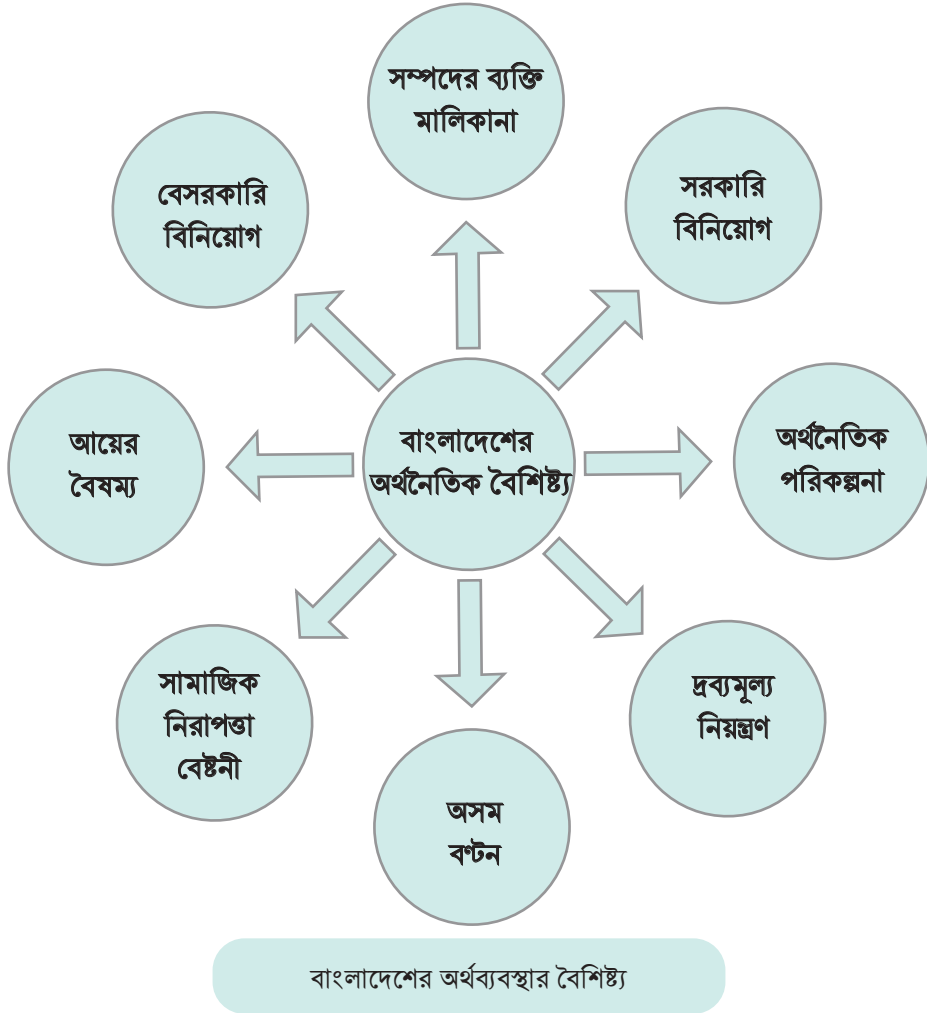
আমরা জানি, ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সম্মুখযুদ্ধ এবং ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলার অর্থনীতিকে ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে গঠন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন-‘আমি বাংলাদেশকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড বানাতে চাই’।

আমরা জানি, সুইজারল্যান্ড কল্যাণমূলক অর্থনীতির একটি দেশ। যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করে। রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে। ধনী ও গরীব মানুষের বৈষম্য নেই বললেই চলে। বঙ্গবন্ধু এমন একটি দেশের মতো বাংলাদেশকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন তিনি। যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য কমে আসবে।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বাঙালির মুক্তির ওপর জোর দিয়েছিলেন। আমরা জানি, মুক্তি শব্দটির বহুমাত্রিক অর্থ রয়েছে। রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়াও সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল তাঁর বক্তব্যে।

আমরা জানি বঙ্গবন্ধু শূন্য কোষাগার দিয়ে দেশের অর্থনীতি শুরু করেছিলেন। যুদ্ধবিক্ষস্ত দেশের রাস্তা, কালভার্ট, রেলপথ, বিমানবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর ধ্বংসপ্রায়। এক কোটি শরণার্থীকে দেশে ফেরত এনে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর স্বাধীন সরকারের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সাড়ে তিন বছরেই বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৯৭২ সালের ৯৩ ডলার থেকে ১৯৭৫ সালে ২৭৩ ডলারে উন্নীত হয়। যা তখনকার সময়ে পাকিস্তান এবং ভারতের মাথাপিছু আয় থেকে বেশি ছিল।

২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি ৭.৫৩% এবং বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি ২৪.৫২% অর্থাৎ মোট বিনিয়োগ জিডিপি ৩২.০৫%। বর্তমান বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি ২৬৮৭ ডলার (২০২১-২২ অর্থ বছরে)।



তঁর রাষ্ট্র গঠনের অর্থনৈতিক দর্শন ছিল গণমানুষের জীবনমানের উন্নতি। জনমানুষের কল্যাণই ছিল তঁর ধ্যান জ্ঞান। তিনি বৈষম্যহীন একটা সমাজব্যবস্থা গড়ার কথা বলেছিলেন যা বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিতে যুক্ত হয়েছিল। তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সোনার বাংলা গড়ার।

এখানে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কীভাবে দেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত গড়ে তোলা যায় তার সেই প্রচেষ্টার প্রমান রয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষাপট পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে।



বাংলাদেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দামব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ব্যবসায়ী শ্রেণি অনেক সময় অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে থাকে বা দাম নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রয়ক্ষমতা যখন ক্রেতাসাধারণের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন সরকার বাজারের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। অনেক সময় সরকার বিভিন্ন দ্রব্যের দাম ঠিক করে দেয়। কখনো সরকারি সংস্থার মাধ্যমে পণ্য বা দ্রব্য আমদানি ও বিপণনের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা দেখা যায় অর্থাৎ বাজারব্যবস্থার পাশাপাশি এখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণও দেখা যায় সাধারণত ক্রেতাদের উপকারের/ কল্যাণের কথা মাথায় রেখে।

বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে, বিশেষ করে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করার পরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ও অন্যান্য সূচক বেশ বেড়েছে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সকল মানুষের জীবনমান এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি। বর্তমান সরকার অসহায় ও দুস্থ মানুষের জীবনমান ও আয়ের সংস্থানের জন্য অনেক দরিদ্রবান্ধব কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন: বয়স্ক ভাতা, অসহায় ও দুস্থ ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি গুচ্ছগ্রাম, গৃহায়ণ প্রকল্প, মুক্তিযোদ্ধা ভাতার মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলেছে। স্বল্প মজুরি বা আয়ের ফলে বাজার থেকে মানুষের অন্যান্য দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার সুযোগ কমে যায়। স্বল্প আয়ের মানুষ সন্তানদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারেনা এবং মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানোর সুযোগ পায় না। তাছাড়া মিশ্র অর্থনীতিতে বাজারের ভূমিকা ক্রমে বাড়ছে। এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতার ফলে মানসম্মত শিক্ষার ব্যয় বাড়ছে। কর্মক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জনে ধনী-দরিদ্রের সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। তবে বর্তমান সরকার বৈষম্য দূর করার জন্য স্কুল পর্যায়ে বিনামূল্যে সব শিক্ষার্থীকে বই সরবরাহসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, এসব প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

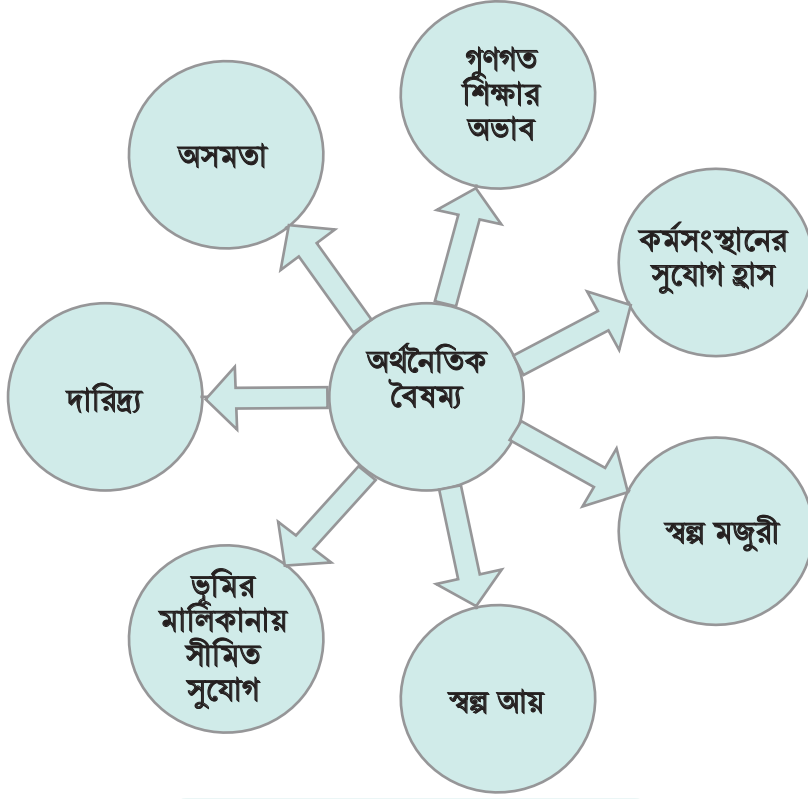
আমরা জানি, গুণগত শিক্ষা মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে। একইভাবে যাঁরা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তাঁদের মজুরি বা আয় কম হয়। সবার জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারলে এবং সাধারণ মানুষ/নাগরিক যদি উন্নত সেবা গ্রহণ করার সুযোগ পায়, তাহলে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যায়। প্রত্যাশা হচ্ছে সবার জন্য গুণগত বা একই মানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সবার অংশগ্রহণ থাকবে। একটি দেশের সকল জায়গায়/অঞ্চলে সমানভাবে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে যাবে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকবে না। আমরা এমন একটি সমাজের কথা বিবেচনা করব যেখানে সমাজের সকল মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার থাকবে।

### এখন আমরা দেখব অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে কীভাবে দারিদ্র্য ও অসমতা সৃষ্টি হয়?

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার একটি বৈষম্যহীন ক্ষুধামুক্ত অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠা। যে সমাজব্যবস্থায় কোনো দারিদ্র্য থাকবে না। আর দারিদ্র্য না থাকলে ক্ষুধামুক্ত সমাজ গঠন সহজে করা যায়। যেখানে ভালো স্বাস্থ্যসেবার কথা বলা হয়েছে। আমাদের সমাজে গুণগত শিক্ষা এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মানুষ এখনো সর্বত্র আমাদের সমাজে নানাভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। যেমন: একই শিক্ষা ও কাজের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সহজে নারী কর্মীদের নিয়োগ দিতে চায় না, বা নিয়োগ দিলেও বেতন তার পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় অনেক সময় কম হয়ে থাকে। এখন বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নে যে কার্যক্রম চলছে, তাতে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে তোমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে।

বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিছু কিছু উন্নয়ন হলেও টেকসই উন্নয়ন হবে না।

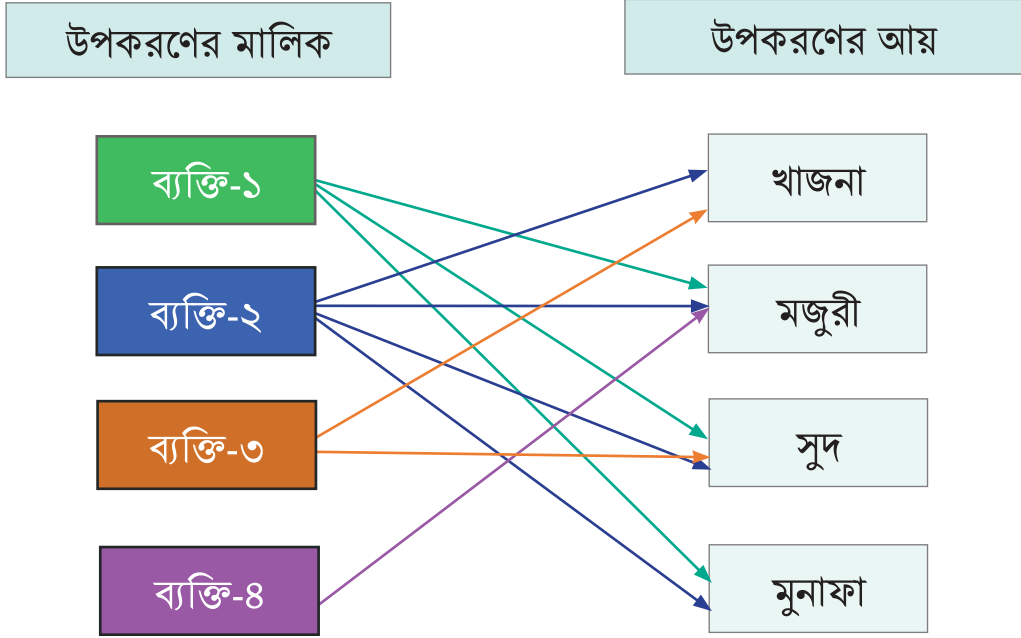


অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাবের চিত্র

উপরের চিত্রের মাধ্যমে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি। মানসম্পন্ন বা গুণগত শিক্ষার সুযোগের অভাবে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায়। এর ফলে তারা দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে ছিটকে পড়ে। অথবা তারা যেসমস্ত কাজের সুযোগ পায়, তার মজুরি কম হয়। এর ফলে আয়ও কম হয়। যার ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ সম্পত্তিতে বা ভূমির মালিকানায় সীমিত সুযোগ পায় বা অনেকাংশে কোনো সুযোগই পায় না। অনেকে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষ যাঁরা স্বল্প মজুরির আয়ে জীবন নির্বাহ করে তারা এক সময় ভূমিহীন পরিণত হয়। উচ্চ আয়ের মানুষজনই পরবর্তী সময়ে ভূমির মালিকানা বা নতুন নতুন ভূমি ক্রয়ের সুযোগ পায়। ফলে গ্রামে যাঁরা কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের হাত থেকে ভূমি ক্রমে উচ্চ আয়ের মানুষের হাতে হস্তান্তরিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সমতার নীতি



আমরা নিচের চিত্র থেকে খুঁজে বের করি কোন ব্যক্তির উৎপাদনের উপাদান বেশি এবং আয় বেশি। আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে ব্যক্তির উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ বেশি তার আয় বেশি। অর্থাৎ যার উপকরণের মালিকানা যত বেশি থাকবে, তার আয়ের পরিমাণ তত বাড়বে। আবার যার উৎপাদনের উপকরণের যোগান সীমিত পরিমাণে রয়েছে রয়েছে তার আয়ের পরিমাণও কম। বাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তি বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/ফার্ম তার আয়ের ভিত্তিতে ভোগ পরিচালিত করবে। অর্থাৎ ভোগ বা ব্যয় নির্ভর করবে তার আয়ের ওপর। বাজার অর্থনীতিতে যার আয় যত বেশি তিনি তত বেশি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করেন এবং বাজার থেকে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারবেন।

আর যার উপকরণের মালিকানা কম অর্থাৎ কম পরিমাণে বা খুব সামান্য উপকরণের মালিকানা থাকে তাঁদের আয়ের পরিমাণ স্বল্প বা অনেকাংশে থাকে না। কারণ, মজুরি কম থাকায় তার আয়ের পরিমাণ কম। কোনো ব্যক্তির আয়ের স্বল্পতার কারণে সে অন্যান্য সম্পদ অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। স্বল্প আয়ের ফলে তার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। যে পেশার মানুষের মাসিক আয় বেশি তার পণ্য বা দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার সুযোগ বেশি। এই আয় বৈষম্যের কারণে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখতে পাই। চলো আমরা এই বৈষম্যগুলো দেখে নিই।



বৈষম্য দূর করার জন্য প্রতিটি মানুষকে পণ্য বা দ্রব্য বা সেবা গ্রহণের সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, লিঙ্গ, পেশা বা অঞ্চলভেদে সবার জন্য গুণগত ও মানসম্মত সেবা গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে। এমন রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন করতে হবে যেখানে সব মানুষের সমান সুযোগ থাকবে। এটাকে আমরা সামাজিক সমতার নীতি বলতে পারি।



#### দলগত কাজ ৪:

এখন আমরা দলগতভাবে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে সমাজে যে বৈষম্য হয় তা দূরীকরণ কীভাবে করা যায় তা নিয়ে একটু চিন্তা করি। এখন আমরা দলে বসে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমতা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি মডেল তৈরি করি। এটা আমরা চার ধরনের অর্থব্যবস্থার আলোকে তৈরি করব। দলে আলোচনা করে মডেলটি কোন উপায়ে উপস্থাপন করব তা ঠিক করি নিই। এটি হতে পারে পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট/পুরোনো ব্যবহৃত ককশিট বা কাগজ দিয়ে তৈরি একটি মডেল। এভাবে প্রতিদল একটি করে মডেল তৈরি করে জমা দিব। মডেলের মাধ্যমে আমরা নিচের কয়েকটি বিষয় তুলে ধরব।

ক. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

খ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে কী কী বৈষম্য তৈরি হয়?

গ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট বৈষম্য কীভাবে দূর করা যায়?

ঘ. এ প্রক্রিয়ায় সামাজিক সমতার নীতি কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে?

